হাওড়ার দুর্গাপুজো: ভট্টাচার্য (চট্টোপাধ্যায়) বাড়ি, মল্লিক ফটক

হাওড়ার অন্যতম প্রাচীন বনেদি পরিবার। আন্দুলের শঙ্করী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধ-সাধক ভৈরবীচরণ ভট্টাচার্যের এক পূর্বপুরুষ দক্ষিণ রাঢীয় ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত নোয়াপারা অঞ্চলের শান্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টাচার্য উপাধিধারী বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের রঘুনাথ তর্কবাগীশ আন্দুলের দত্তচৌধুরী পরিবারের কর্ত্তৃক আন্দুলে সপরিবারে প্রতিষ্ঠা হন। পরিবারের মতে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে শরৎকালে ইনি-ই দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন এ পরিবারে। আনুমানিক ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভৈরবীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র গোপীমোহন ভট্টাচার্য তাঁদের আন্দুলের পৈতৃক বিষয় আসয় ছেড়ে বর্তম্মান হাওড়া শহরের মল্লিক ফটক অঞ্চলে চলে আসেন। আন্দুলের তৎকালীন জমিদার বসুমল্লিকদের দান করা সেখানে ভদ্রাসনের উপর তৈরী হয়েছিল 'ফ্ল্যাট-রুফ' ও তিন-খিলান বিশিষ্ট ঠাকুরদালান যুক্ত বসতবাড়ি। মল্লিকদের গুরুবংশ ছিল এই ভট্টাচার্যরা। এই ভাবেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল মল্লিক ফটকের ভট্টাচার্য পরিবার। গোপীমোহনের চারটে পুত্রসন্তান, যথাক্রমে লক্ষীনারায়ণ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দ্বিপনারায়ণ এবং প্রতাপনারায়ণ। রামনারায়ণের আবার চারটে পুত্রসন্তান, যার মধ্যে দ্বিতীয় ছিল উমাচরণ। এই বাড়ির সংলগ্ন রাস্তাটি এই উমাচরণের নামেই 'উমাচরণ ভট্টাচার্য লেন' হিসেবে চিহ্নিত হয়।

Srisri Samkari Mata (Devi Shiddeshvari Kalika)

শঙ্করী কালি, চৌধুরী পাড়া, আন্দুল

ওতে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের আন্দুলের বাড়িতে শুরু করা দুর্গাপুজো ১৭৬৫ এর আসে-পাশে স্থান পরিবর্তন করে বর্তমানে হয় তাঁদের মল্লিক-ফটকের বাড়িতে। আন্দুলে এঁদের দুর্গাপুজো তাই আর হয়ে না। আন্দুলের দক্ষিণ পাড়াতে এঁদের এক শাখা (প্রেমিক ভবন/মাঝের বাড়ি) আছে সেখানে আনুমানিক সতেরো সত্তর দশক থেকে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে।

মল্লিক ফটকের ভট্টাচার্য (চট্টোপাধ্যায়) বাড়ির

বর্তমানে মল্লিক-ফটকের বাড়িতে ভট্টাচার্যদের বাস নেই, আছে তাঁদের দৌহিত্র চট্টপাধ্যায়দের। উমাচরণের চার পুত্র সন্তান, যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন বরদাচরণ ভট্টাচার্য। দান-ধর্ম্মের জন্য স্থানীয়দের কাছে উনার নাম-ডাক ছিল। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বাড়ির ঠিক বিপরীতেই হাওড়া রামকৃষ্ণপুর হাই স্কুল স্থাপন করেন। উনার একটি মাত্র কন্যাসন্তান ছিল, অভয়াবালা (১৮৭০-১৯৬২)। অভয়াবালার বিবাহ হয় হুগলি জেলার বৈদবাটির তৎকালীন কাশ্যপ গোত্রীয় জমিদার ক্ষিতিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্গে। অভয়বালা দেবী বিবাহের পরেই তাঁর বাপের বাড়িতেই কাটাতেন। দুর্গাপুজোর পুরো দ্বায়িত্ব নেন নিজেই। অভয়বালার চারপূত্র — রাজেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ। এই চার ভাই একসাথে পুজোর দ্বায়িত্বে থাকেলেয় ১৯৮৪-র পর ভূপেন্দ্রনাথের পরিবারেই দ্বায়িত্ব ভার বহন করে। এই ভাবে মল্লিক-ফটকের ভট্টাচার্য বাড়ি তাঁদের দৌহিত্র চট্টোপাধ্যাদের হয়ে যায়।

ভট্টাচার্য (চট্টোপাধ্যায়) বাড়ির মহিষমর্দিনী

মাটির তৈরি অস্থায়ী মূর্তিতে দশভুজা সসিংহ মহিষমর্দিনী, সরস্বতী-কার্তিক-লক্ষ্মী-গণেশ যুক্ত ডাকের সাজে একচালাতে পূজিতা। আধুনিক রূপের সিংহ। চালচিত্রে বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি আঁকা হয়ে থাকে যার মধ্যে অন্যতম হল করলাবদনা চামুণ্ডা। সেই অঙ্কনে যোগিশিব থাকে চামুণ্ডার পাশে। সোজা-রথের দিন কাঠমো পুজো হয়। শুক্লা প্রতিপদে একটি ঘটে বসে দেবীর চণ্ডির উদ্দেশ্যে, পুজো হয়ে নবমী পর্যন্ত। কালিকাপুরাণ মতে গুপ্ত প্রেস উনুযায়ী, তন্ত্রের আচারে দেবীর দুর্গার পুজো হয়ে থাকে। এই পরিবারের নব-পত্রিকা স্নান এক বিশেষ ভাবে হয়ে থাকে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে অন্নভোগের সাথে রান্না করা মাছ দেওয়া হয় দেবীকে। পূর্বে এই বাড়িতে মহিষ বলি, তার পর পাঠাবলির কথা শোনা যায় পরিবারের থেকে। বর্তমানে এইসব বন্ধ, পাঠাবলি বন্ধ হয় ১৯৮৪-এ, তার জায়গায় অষ্টমীতে হয় বাতাবি লেবুর বলি, নবমীতে হয় চাচি কুমড়া, বাতাবি লেবু এবং আঁখ বলি, ওই পুরোনো হাড়িকাঠে, সেই পুরোনো খাঁড়া দিয়েই। সন্ধিপুজোর সময় লুচি-ভোগ দেওয়া হয়। ঘি দিয়ে এক বিশেষ রকমের আরতি এই পুজোর বৈশিষ্ট। সেই সময় ১০৮টা প্রদীপ পরিবারের ছেলেরা জ্বালানোর নিয়ম এই বাড়ির রীতি। এ পরিবারে সন্ধিপুজোর একটি বিশেষ অঙ্গ হল চৌষট্টি যোগিনী পুজো যেখানে

৬৪টা পদ্ম দেওয়া হয়। নবমীতে কুমারী পুজো। বিজয়া দশমীর দিন বরণ-কনকাঞ্জলি দেওয়ার পর শোভাযাত্রা করে হুগলি নদীর রামকৃষ্ণপুর ফেরি ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়।

ছবি: পরিবারিরের সূত্রে সংগৃহীত।

লেখা: ধ্রুব দত্তচৌধুরী।
ডিসক্লেমার : সব ভাবনা লেখকের নিজের।